Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 100–109
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্প : ভয়ের এক ভিন্নতর চিত্র

প্রতাপ চন্দ্র দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : pratapchandradas239@gmail.com

Keyword
ভয়, প্রেতপুরী, ভয়ঙ্কর, আতঙ্ক, প্রেতিনী, ভূতুড়ে খাদ, কে তুমি?

Abstract
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। একাধারে তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, সম্পাদক এবং চিত্র পরিচালক। কর্মজীবনের সুবাদে তিনি কয়লাখনি অঞ্চলে যাতায়াত শুরু করেন। সেখানে নিয়তিতাড়িত শ্রমিক-মজুরদের কাছ থেকে দেখেছিলেন। অনুভব করেছিলেন এই নামহীন, অন্ত্যজ কুলি-কামিন, সাঁওতাল, বাউরি মানুষদের দুঃখ-দুর্দশাজনিত সামগ্রিক জীবনকে। আর এখান থেকেই বেরিয়ে আসে তাঁর 'কয়লাকুঠি' সংক্রান্ত কালজয়ী সাহিত্য। তাঁর একাধিক ভূতের গল্পগুলির কাহিনি কয়লাকুঠি কেন্দ্রিক হলেও মানব জীবনের নানা দিক নিয়ে ভূতের গল্পগুলি রচিত। ভূত ও আত্মাদের ক্রিয়াকলাপ, প্ল্যানচেট ও বয়স্কদের ভয়জনিত জীবন-ট্রাজেডি-গল্পগুলিতে এক অদ্ভুত রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। তাঁর সৃষ্ট ভূতেরা ভয়ঙ্কর নয়- মানবিক। শৈলজানন্দ দেখিয়েছেন, ভূতেরাও মানুষের উপকার করে প্রাণ বাঁচায় এবং বিপদে মানুষের পাশে এসেও দাঁড়ায়। বিশেষত তাঁর গল্প সমাজসচেতনতা ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতির ছোঁয়ায় এক অদ্ভুত ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি করে।

Discussion
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। লেখক শৈশবেই মাতৃহীন হলে দাদামশাই বীরভূম থেকে নিজের কাছে বর্ধমানে নিয়ে আসেন। এখানে 'মোহামেডান বোর্ডিং'এ নজরুল ইসলামের সঙ্গে লেখকের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়- শৈলজানন্দের সাহিত্যকর্মের হাতেখড়ি এখানেই। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সেনাবাহিনীতে নাম লেখাতে যান। কিন্তু বাড়ির আপত্তিতে তা আর হয়ে ওঠেনি। অতঃপর ডাক্তারি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে সাহিত্যকর্মে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। কর্মসূত্রে লেখক কয়লাখনি অঞ্চলে যাতায়াত শুরু করেন। কয়লাখনিতে কুলিমজুরের খোঁজে তাঁকে সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হত, ফলে সেখানে কয়লাখনির শোষিত শ্রমিক-মজুরদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। 'রেজিং রিপোর্ট' (১৩২৯), 'কয়লাকুঠি' (১৯৩০), 'কয়লাকুঠির দেশ' (১৯৫৮), 'নারীর মন' (১৩৩০) ইত্যাদি লেখায় কয়লাখনির শ্রমিকদের দুর্দশা ও অত্যাচারের কাহিনি প্রকাশিত হয়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর কয়লাকুঠির দেশ-এ আঞ্চলিক সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন।

তাছাড়া খনির শ্রমিকদের নিয়ে লেখায় তিনিই হলেন পথিকৃৎ। সাহিত্যসমাজে তাঁর প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে, শরৎচন্দ্রের পরে এমন সাড়া জাগানো আত্মপ্রকাশ আর কোনও সাহিত্যিকের জীবনে ঘটেনি। তিনি 'কল্লোল', 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। আবার চিত্র পরিচালনাও করেন- 'নন্দিনী', 'মানে না মানা', 'শহর থেকে দূরে' ইত্যাদি চলচ্চিত্র প্রভৃত সাফল্য অর্জন করে। তাঁর অমূল্য স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে'। শৈলজানন্দের উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় দুইশত এবং গল্পের সংখ্যা চারশোরও বেশি। বিষয় অনুসারে তাঁর গল্প গুলিকে বিভিন্ন ভাগে সাজানো যায়, যথা- কয়লাখনি অঞ্চলের, গ্রামজীবনভিত্তিক, নাগরিকজীবনভিত্তিক, প্রেম-ভালোবাসাভিত্তিক, অনুবাদ, পশুপক্ষীপ্রীতিনির্ভর, বারোয়ারি, ভৌতিক বা অলৌকিক গল্প প্রভৃতি। তিনি তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মানব জীবনের সর্বত্র অবাধে বিচরণ করেছেন। শৈলজানন্দের গল্প সম্পর্কে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,

> "শৈলজানন্দের গল্প 'বাস্তব' (রিয়ালিস্টিক) বলিতে যাহা বোঝায় শুধু তাহাই নয়, 'বাস্তবিক'ও। তীব্র অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ অনুভব শৈলজানন্দের সাহিত্য-সাধনাকে পরিচিত সরণি হইতে ভুলাইয়া উপেক্ষিত-অবজ্ঞাত মানুষের অপরিচিত জীবনের অনাবিষ্কৃত গহনের দিকে পরিচালিত করিয়াছিল। ...স্থান-কাল-ভাষা-পরিবেশের সৌষ্ঠব, যাহাকে ইংরাজীতে বলে 'লোক্যাল কালার', তাহা শৈলজানন্দের গল্পে পরিপূর্ণভাবে দেখা গেল। অথচ কাহিনির অত্যন্ত জৈবিক মানুষগুলি স্থান-কাল-পরিবেশের মধ্যে কোথাও খর্ব হইয়া হারাইয়া যায় নাই। বিষয় সর্বদা জীবন্ত, অনেক সময় নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত। ইহাও বাঙ্গালা সাহিত্যে কিছু নূতন।"[১]

বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যে ভৌতিক বা অলৌকিক বিষয় নিয়ে কাহিনি রচনা করেননি এমন সাহিত্যিক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পাশ্চাত্য গল্পসাহিত্যে গোগোলের 'Christmas Eve', H. G. Wells-এর 'The Red Room', আগাথা ক্রিস্টি'র 'The Last Séance', এডগার অ্যালান পো-এর 'Shadow-A Parable', গী দ্য মপাসাঁ'র 'Was it a Dream?' ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের- 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'কঙ্কাল', হেমেন্দ্রকুমার রায়ের- 'মড়ার মৃত্যু', 'বন্দি আত্মার কাহিনি', 'কঙ্কাল সারথি', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের- 'অন্ধকারে', 'পিন্টু', 'বহুরূপী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের- 'অশরীরী', 'মায়া', 'ছায়াছবি', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের- 'ডাইনি', 'ভূত পূরাণ', 'ভুলোর ছলনা', গজেন্দ্রকুমার মিত্রের- 'অতৃপ্ত', 'পাষাণের ক্ষুধা', 'প্রেতের আলিঙ্গন', প্রেমেন্দ্র মিত্রের- 'তেনারা', 'কলকাতার গলিতে', 'মাঝরাতের কল', লীলা মজুমদারের- 'পেনেটিতে', 'আহিরিটোলার বাড়ি', 'ভাগ্যদেবী ব্রাঞ্চ হোটেল', হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের- 'বিনোদ ডাক্তার', 'রাত গভীর', 'লাল নিশানা', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের- 'রাতের মানুষ', 'নিঝুম রাতের আতঙ্ক', 'ভৌতিক অ্যাডভেঞ্চার', ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের- 'প্রেতাত্মার ডাক', 'লালুমিঞার মাঠ', 'সতে মুচি' ইত্যাদি। উক্ত সাহিত্যিকেরা বিভিন্ন ধরণের-বিচিত্র রসের ভৌতিক কাহিনি রচনা করে বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ভূত আছে কি নেই? এ তর্কের মীমাংসা আজও হয়নি- তবে সারা পৃথিবীময় অশরীরীর অস্তিত্ববিষয়ক গবেষণার অন্ত নেই। বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকেরা ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে স্যার অলিভার লজ, কোনান ডয়েল প্রমুখেরাও মেনেছেন অশরীরীর অস্তিত্ব।

শৈলজানন্দ তাঁর ভূতের গল্প গুলিতে মানুষের সংস্কার-বিশ্বাসের পাশাপাশি, ততকালীন সমাজচিত্র দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর 'ভয়' গল্পটিতে দেখতে পাই, রেল ষ্টেশনের ফটকরক্ষী রাম সিং-এর সর্বক্ষণের সঙ্গী ভিখারী রঞ্জন। রঞ্জন ভীক্ষা করে যা পাই, তা রাম সিং কে দেয়-বিনিময়ে রুটি, গাঞ্জা এবং ছোট্ট টালির ঘরে শোয়ার স্থান পাই। ষ্টেশনের খালাসীরা রঞ্জনের কাছে ভূতের গল্প শোনার জন্য জটলা পাকায়। প্রকৃতপক্ষে রঞ্জন ভীতু কিন্তু সকলের কাছে নিজের সাহসিকতার ভয়ঙ্কর সব গল্প বলে-যা শুনে খালাসীরা প্রচন্ড ভয় পাই। লেখকের ভাষায়,

> "নামলাম নদীতে। জায়গাটার নাম শ্মশান-ঘাটা। আশপাশের গাঁয়ের লোক সেখানে মড়া পোড়ায়। বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। মস্ মস্ করে শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ কী যেন একটা নরম জিনিসের গায়ে পা ঠেকলো। পা দিয়ে নেড়ে-চেড়ে বুঝলাম-হাত, পা, মাথা, চুল-সবই রয়েছে, একটা আস্ত মানুষ! কলেরার কড়া। না পুড়িয়ে শ্মশানে ফেলে দিয়ে গেছে। তা হোক্। পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু যেতে গিয়ে দেখি- চলা দায়। যেদিকে যাই, সেদিকেই হয়ত কারও হাত মাড়িয়ে ফেলি, কারও পা, কারও বা মাথার খুলিতে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সাম্‌লে নিই। তিনটি ছোট ছোট বেঁটে বামনের মত মানুষ আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে। পা-গুলো উল্টো

দিকে বাঁকানো। ভূতের পা শুনেছি ওই রকম হয়। তবে কি ভূত নাকি? খুব জোরে জোরে বলে উঠলাম রাম! রাম!"[২]

রঞ্জন ভীতু প্রকৃতির-একথা খালাসীরা জানতে পারলে এবং ফটকরক্ষী রাম সিং মারা গেলে- রঞ্জন একা হয়ে যায়। রাম সিং-এর চাকরিটা রঞ্জন পাই কিন্তু রাম সিং-এর আত্মার ভয় তাকে পেয়ে বসে। রঞ্জন তার সাত বছরের নাতনি কালীকে নিয়ে আসে। কালি শুধু খায়দায় আর ঘুমোয়। রঞ্জনের ভয় লাগে। মনে হয় রাম সিং যেন আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। হরিশপুর গ্রামে কলেরা দেখা দিলে শহর থেকে ডাক্তার আসেন কিন্তু ডাক্তার নিজেই কলেরায় মারা যান। গ্রামের লোকেরা মাঝরাতে ডাক্তারের মৃতদেহটা রঞ্জনের বাড়ির সামনে ফেলে রেখে চলে যায়। রঞ্জন সেই মৃতদেহের মুখের ঢাকা খুলে দেখতে গিয়ে আতঙ্কে হার্টফেল করে মারা যায়। নাতনি কালী তখনও ঘুমোচ্ছে। যে রঞ্জন ভূতের গল্প বলত এবং কালী শুধু ঘুমোয় বলে তাঁর মৃত্যু কামনা করত সে নিজেই ভৌতিক আতঙ্কে মারা যায়। এই গল্পটি শৈলজানন্দ একটি বৈপরীত্যের চমক সৃষ্টি করেছেন- বয়স্কের ভয়জনিত জীবন-ট্রাজেডির পাশাপাশি বালিকার চিন্তাহীন সুষুপ্তির মধ্য দিয়ে।

'প্রেতপুরী' গল্পটিতে শৈলজানন্দ কয়লাকুঠিতে কর্মরত গরিব শ্রমিকদের জীবন-যন্ত্রনার গল্প শুনিয়েছেন। কয়লাকুঠির ম্যানেজার অতিরিক্ত মুনাফার জন্য অনৈতিকভাবে সরল প্রকৃতির সাঁওতাল কুলিকামিনদের অনায়াসে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেন। কয়লাখাদের মধ্যে কয়লার চাঙড় ধসে পড়ে বা জল ঢুকে যায়-এতে খাদের মধ্যে কর্মরত গরিব শ্রমিকেরা মারা যায়। এদের আত্মারা এইসব খাদের মধ্যে থাকে- তাদের অমানুষিক হাহাকার গোটা খাদটাকেই প্রেতপুরীতে পরিণত করে। গল্পটিতে দেখতে পাই, কয়লাখাদের কিছুটা দূরে প্রবাহিত সিঙ্গারন নদীতে প্রবল বর্ষায় বন্যা দেখা দিলেও ম্যানেজার খাদে কর্মরত শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করতে নির্দেশ দেননি। ফলে বন্যার জল খাদে ঢুকে টুইলা মাঝি ও তার বড় ছেলেসহ ত্রিশ জন শ্রমিকের প্রাণ যায়। আবার রাত্রিবেলায় সাধারণত খাদের কাজ বন্ধ থাকে, কিন্তু ম্যানেজার শ্রমিকদের মদ খাইয়ে বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে খাদে কাজ করতে পাঠায়। ফলে টুইলা মাঝির ছোট ছেলে গাংটুর মৃতু হয়। গাংটুর মৃতদেহ দেখার জন্য তার মা খাদের উপরে কাঁদতে থাকে। টুইলা মাঝির সংসারে নেমে আসে মর্মান্তিক বিপর্যয়। কয়লাখাদে মৃত্যু হওয়া টুইলা মাঝির প্রেত, ম্যানেজারের প্রতি প্রতিশোধের বদলে করুণ আর্তনাদ করে বলে ওঠে-

"হেই ম্যানেজার, আমাদের সবাইকেই ত সাবাড় করেছিস তুই। এবার ওই বুড়িকে যদি না মারিস ত তুখে দিব্যি রইলো। বুঝলি? (গলার আওয়াজ তাহার ভারী হইয়া আসিল) কই, কথার যে আমার জবাব দিছিস নাই। বল কি বলছিস! গাংটু! গাংটু! (কান্নাকাতর কণ্ঠ তাহার দূরে মিলাইয়া গেল)"[৩]

'ভয়ঙ্কর' গল্পটি সুন্দর সিং ও দীননাথ জেলের জীবন কাহিনি। গল্পটিতে ভূত নেই-তবে ভয়ের অদ্ভুত পরিবেশ রচনা করেছেন লেখক। পশ্চিম ভারতের সুন্দর সিং স্ত্রী রুক্মিণীর পরকীয়ার কারণে রেলের ফটকরক্ষীর চাকরি নিয়ে একরকম পালিয়ে আসেন সুদূর মাধবপুর গ্রামে। সুন্দর সিং-এর একমাত্র সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায় দীননাথ। দুই বয়স্ক সারাদিন এক সঙ্গে গল্পগুজব ও গাঞ্জা খেয়ে কাটালেও অন্ধকার হওয়ার আগেই দীননাথ নিজের বাড়ি ফিরে আসে। দীননাথ অন্ধকারকে অনেক ভয় পাই-বিশেষত ভূতের ভয় তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তার অন্ধকারজনিত ভূতের ভয়ের কথা গ্রামের সকলেই জানে। এদিকে ত্রিশ বছর সময় অতিক্রান্ত হলেও সুন্দর সিং তার বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে ভুলতে পারেনি। তাই প্রতি মাসে দশ টাকা করে মানি অর্ডার পাঠায়। প্রবল জ্বরে দীননাথের স্ত্রী মারা গেলে, সুন্দরের কাছেই থাকে দীননাথ। মরার আগে সুন্দর সিং তার জমানো দু'শ দশ টাকা দিয়ে যায় দীননাথকে। দীননাথ টাকাটা সুন্দর সিং-এর স্ত্রীকে দিতে গেলে- সেখানে রুক্মিণীর পরকীয়াজনিত এক জঘন্য রূপ দেখতে পাই। তাছাড়া সুন্দর সিং-এর প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা না দেখতে পেয়ে, টাকা দূরে থাক-মৃত্যুর খবর পর্যন্ত না দিয়ে দীননাথ মাধবপুরে ফিরে আসে। এরপর দীননাথের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যে দীননাথ রাত্রির অন্ধকারে ঘর থেকে বার হতে পারতো না, সে গভীর রাত্রিতে বন্ধু সুন্দরের আত্মাকে খুঁজে বেড়ায়। সবসময় মনে হয় সুন্দর সিং যেন তার পাশেই আছে। অমাবস্যার রাত্রিতে শ্মশানে যেতেও তার ভয় করে না। দীননাথের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় সুন্দর একদিন ফিরে আসবেই।

'ভূতুড়ে বই' গল্পটিতে শৈলজানন্দ একটি উপকারী ভূতের গল্প বলেছেন। লেখক এই গল্পটির মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন ভূতেরাও মানুষের উপকার করে, মানুষের প্রাণ বাঁচায়, পূর্বঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। গল্পটিতে দেখতে পাই, কলকাতা শহরে প্রবল বর্ষণের পর বিকালে বৃষ্টি ধরলে, বক্তা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ

ধরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে থাকেন। বক্তা ফুটপাথে পুরনো বই-এর দোকানে একটা বই কিনতে বাধ্য হন কিন্তু তিনি বইটা বাড়িতে নিয়ে যেতে চাননি তাই রাস্তায় ফেলে দিলেন। হঠাৎ একটা বাচ্চা ছেলে এসে বইটা আবার তাঁর হাতে দিয়ে চলে যায়। বক্তা বইটাকে একটা বাড়ির পাঁচিলের ওপারে ফেলে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন কিন্তু একটা মেয়ে এসে বইটা আবার তাঁকে ফেরত দিয়ে যায়। তখন বাধ্য হয়ে বক্তা বইটাকে ঘরে এনে বইয়ের তাকে অন্য সব বইয়ের মধ্যে রেখে দিলেন। রাত্রে বক্তা ঘরে এসে দেখেন বইটা টেবিলের ওপর খোলা পড়ে আছে-মনে হচ্ছে কেউ যেন এইমাত্র পড়ছিল বইটা। বক্তা দেখলেন একটা লাইনের ওপর লাল পেন্সিলে দাগ টানা রয়েছে, সেখানে লেখা রয়েছে-

> "মানুষের মৃত্যুর কোনও স্থিরতা নাই। যে কোনও মুহূর্তে তুমি মরিয়া যাইতে পার। সুতরাং তাহার পূর্বে তোমার ঋণ তুমি পরিশোধ করিও। তাহা না হইলে..."[৪]

লেখাটি পড়ে বক্তার মনে পড়ে, বন্ধু অজিতের কাছে তাঁর পাঁচ টাকা ঋণ রয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ বক্তা অজিতের বাড়ি যান, গিয়ে দেখেন অজিত খুব অসুস্থ-টাকার জন্য ইঞ্জেকশন কেনা যাচ্ছে না। বক্তা অজিতের দিদির হাতে পাঁচ টাকা দিয়ে আসেন। কয়েকদিন পর বক্তা খবর পান, তার দেওয়া পাঁচ টাকার জন্যই অজিত সুস্থ উঠেছে- নইলে বাঁচত না। বক্তা ভেবে কোন কূল-কিনারা পান না- অজিতের সুস্থ হওয়ার সাথে ভূতুড়ে বইটিরও কি কোন সম্বন্ধ রয়েছে?

'কি?' গল্পটির পটভূমি বীরভূম। লেখক বক্তা হয়ে একটি ভৌতিক ঘটনার বর্ণনা করেছেন। বক্তা গিয়েছিলেন গোপালপুর গ্রামে কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ আনতে। কিন্তু বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়-তারপর আবার অমাবস্যার রাত্রি। গ্রামের পথ ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। বক্তা শ্মশানের ওপর দিয়ে যাবার সময় একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে চমকে দাঁড়ান-লেখকের ভাষায়,

> "মনে হল, নিকটেই কোথায় যেন ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম করে ঘুঙুরের শব্দ হচ্ছে। ...সেই জায়গাটাই কে যেন অন্ধকারে ভূতের মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে-কালো একটা লম্বা মানুষের মত। গাটা একবার ছম্ ছম্ করে উঠলো। ...গ্রামের জটি-পাগলি এমন করে শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়, আর বিড়্ বিড়্ করে আপন মনেই কী যেন বকে। ভাবলাম, সে ছাড়া এ আর কেউ নয়।"[৫]

বক্তা তাকে ধরে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন। গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে বক্তা বুঝতে পারেন, এর হাসি কোনও যুবতীর। বক্তা তাকে ছেড়ে দিয়ে বলেন- 'তুই গেছিস তো পাগলি?' জবাব আসে 'হ্যাঁ, তুমি যাও'। তার গলার আওয়াজে বক্তা চমকে উঠলেন। কারণ এ তো তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর, যে ক'দিন আগেই মারা গেছে। বক্তা পরদিন সকালেই জটি-পাগলির বাড়িতে এসে দেখেন- বুড়ি মাসাবধিকাল রোগে ভুগে জীর্ণ কঙ্কালসার অবস্থায় বিছানায় শুয়ে রয়েছে। বক্তা বুঝতে পারেন, গত রাত্রে তার নিজের স্ত্রী ভূত হয়ে তাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'নমস্কার' গল্পটিতে একটি উপকারী ভূতের গল্প শুনিয়েছেন। গল্পটিতে দেখতে পাই, বক্তা ট্রেনে চেপে শালবুনি যাচ্ছেন-নতুন চাকরিতে যোগ দিতে। সেখানে পদে পদে মৃত্যু ভয় আছে কারণ, এর আগে আরও তিনজন এই চাকরিতে এসে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেননি। ট্রেনে আপাদমস্তক সাদা চাদরমুড়ি দেওয়া কালো প্রকান্ড লম্বা কিম্ভূতকিমাকার চেহারার একজন লোক বক্তার পাশেই বসেন। লোকটির চেহারা দেখে বক্তা ভয়ে শিউরে উঠেন। লোকটি বক্তার কাছে জানতে চান-সে এই কাজে যোগ দিতে যাচ্ছেন কেন? বক্তা জানান তাঁর কোন উপায় নেই, বাড়িতে বুড়ো বাবা-মা, পিসি-মাসি, স্ত্রী, তিনটি ছেলে-মেয়ে, ভাগনে-ভাগনি সকলের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রয়েছে। বড় সংসার-তাই এই চাকরি নিতে বাধ্য। বক্তা লোকটিকে বিড়ি ও দেশলাই দিলেন কিন্তু সে না খেয়ে চলন্ত ট্রেন থেকেই নেমে পড়েন। বক্তার দেশলাইটিও ফেরত দিলেন না। কাজে যোগ দিয়েই বক্তা বিপদে পড়লেন। রাত্রিবেলা দুজন গুর্খা চাপরাশি রামলাল ও শিউশরণ বক্তাকে বেঁধে টাকাকড়ি লুঠ করে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু হঠাৎ প্রকান্ড একটা লোক এসে রামলালকে হত্যা করে বক্তাকে বাঁচান এবং শিউশরণের দুটো পা ভেঙ্গে দিয়ে যায়। কোম্পানির সাহেবরা এসে টাকাকড়ি এবং বক্তাকে উদ্ধার করেন। সাহেবের লাথি খেয়ে শিউশরণ বলল একটা লম্বা ভূত এসে তাদের খুব মেরেছে। এমন সময় বক্তার পায়ের কাছে টুপ করে একটা দেশলাইয়ের বাক্স পড়ে। লেখকের ভাষায়,

> "তুলে দেখি-একটা দেশলাই-এর বাক্স। এইটেই সেদিন আমি তাকে ট্রেনের কামরায় দিয়েছিলাম, কিন্তু ফেরত দিতে সে ভুলে গিয়েছিল। এদিক-ওদিক বহুদূর পর্যন্ত তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। সমস্ত শরীর তখন আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কে সে? যে-ই হও, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। তোমায় নমস্কার।"[৬]

লেখকের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ গল্প 'অসম্ভব'। গল্পটিতে লেখক কলকাতা, বোম্বাই, লাহোর আর মাদ্রাজ-শহরে চারটি গুপ্ত-সমিতির কথা বলেছেন। এই সমিতির সভ্যদের কাজ অন্ধকার রাতে নির্জন কক্ষে বসে নানারকমের যন্ত্রপাতি নিয়ে ভূত নামানো। মানুষের মৃত্যুর পর সেই মরা মানুষটিকে নিয়েই তাদের কারবার। বক্তা একদিন এই গুপ্ত সমিতির চিঠি পেয়ে সেখানে যান। লেখকের ভাষায়,

> "...সিঁড়ির ওপর পা দিয়েই আবার দেশলাই জ্বাললাম। কিন্তু আশ্চর্য, ফুঁ দিয়ে দেশলাইটা কে যেন নিবিয়ে দিলে। দু'তিনজন লোক একসঙ্গে কেমন যেন একটা অদ্ভুত কণ্ঠে হি হি করে হেসে উঠল। কী এক অজ্ঞাত আতঙ্কে আমার শরীরের সমস্ত লোমগুলো তখন খাড়া হয়ে উঠেছে। তৎক্ষণাৎ কে যেন পিছন থেকে আমার মুখখানা চেপে ধরল। চৈতন্য ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, প্রকান্ড একটা ঘরের মধ্যে একটি ইজিচেয়ারের ওপর আমি শুয়ে আছি, আর আমার দুপাশে দুটি চেয়ারে দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন। লোক দুটির মুখের পানে তাকিয়ে দেখি অদ্ভুত মুখ। একজনের মুখখানি যেমন গোলাকার, আর একজনের মুখখানি তেমনি লম্বা। একজনের নাম জগন্নাথ, আর একজনের নাম চমনলাল।"[৭]

জগন্নাথ, বক্তার কাছে জানতে চান গুপ্ত সমিতিতে সে এল কী করে? বক্তা একটি চিঠি দেখান তাদের-চিঠি দেখে তারা সহজেই বুঝতে পারে মৃত গোপীনাথের ভূত এ কাজ করেছে। বক্তা বলেন- এই গোপীনাথের ভূতের কারণেই মস্‌জিদবাড়ি স্ট্রিটের বাড়িটি আমাকে ছাড়তে হয়। বাড়িটিতে মাছ-মাংস রান্না করলে ভূতটি সব খেয়ে নিত, এমন কি আমার ভাই অরুণকে মেরে ফেলে এই গোপীনাথ। গোপীনাথ তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসত, তাই তাকে ছাড়া বাকি সকলকেই তার হাতে নাজেহাল হতে হয়। এমন কি গুপ্ত সমিতির লোকেরাও গোপীনাথের ভূতের সাথে পেরে উঠে না।

'ন্যাড়া নন্দী' গল্পটি অদ্ভুত এক ভৌতিক পরিবেশকে অবলম্বন করে রচিত। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্বভাব-সিদ্ধ, সহজ-সুন্দর গল্প বলার ধরণ তাঁর যেকোনো গল্পেরই মূল আকর্ষণী শক্তি। গল্প বলার কৌশলেই নিতান্ত সাদামাটা গল্পও অসামান্য হয়ে ওঠে। এই গল্পটিতে দেখতে পাই, সাম্‌তা গ্রামের ন্যাড়া নন্দী প্রতি অমাবস্যায় ভূত নামায়। গ্রামের লোকেরা তা বিশ্বাস করে। যে-সব মেয়ের ছেলে হয় না, যাদের ছেলে হয়ে মরে মরে যায়, যাদের দুরারোগ্য ব্যাধি রয়েছে- সেই সব মেয়েরা তার কাছে যায়। পুরুষ-ব্যাটাছেলের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। ন্যাড়া নন্দী মেয়েদের শেকড়বাকড়, মাদুলি প্রভৃতি দেয়-বিনিময়ে টাকা, কাপড় নেয়। এক অমাবস্যায় টাকার ভাগকে কেন্দ্র করে ন্যাড়া নন্দী ও তার দুই ছেলের মধ্যে ঝগড়া হয়, তাদের কথোপকথন শুনে সেখানে উপস্থিত সকলেই তাদের বুজরুকি বুঝতে পারে। গ্রামজীবনের লোকাচার, বিশ্বাস, ভয়, কুসংস্কার প্রভৃতিকে ভিত্তি করে গল্পটি রচনা করেছেন লেখক।

শৈলজানন্দের একটি বিশিষ্ট গল্প হল 'ভূতের গল্প'। গল্পটির একটি বিশেষ চরিত্র ঝুঁকোবাবু। সত্তর বছর বয়স। তিনি ঝুঁকে ঝুঁকে চলেন-তাই তার নাম ঝুঁকোবাবু। বক্তার নাতি বাচ্চু ও মুকুলকে তিনি অনন্ত বসাক বাড়িওয়ালার ভূতের গল্প শোনান। দ্বিতল বাড়ির ওপর তলায় থাকেন অনন্ত বসাক আর নীচের তলায় ভাড়াটে, তান্ত্রিক-ব্রাহ্মণ কাশীশ্বর বিদ্যারত্নমশাই। কাশীশ্বর ভাড়া দেন না। এদিকে দিন-রাত্রি অনন্ত বসাকের ঘরেই ঢিল পড়তে থাকে। সবাই ভাবে ভূতে ঢিল মারছে। পুলিশও এক্ষেত্রে কিছু করতে পারে না। শেষে জানা যায়, কাশীশ্বর বিদ্যারত্নমশাই অনন্ত বসাকের ঘরে ঢিল ছোঁড়ে। তিনিই আসল ভূত-জ্যান্ত ভূত। ঝুঁকোবাবু হাসি,মজা ও নানারকম ঘটনার মিশ্রণে বেশ সুন্দর কাহিনি শুনিয়েছেন 'ভূতের গল্প' গল্পটিতে।

লেখক 'ভীষণ কান্ড' গল্পটিতে ভয়ঙ্কর রহস্যের কাহিনি রচনা করলেও রহস্য উন্মোচন করেননি। মাসির অসুস্থতাজনিত একটা ফোনে আনন্দের জীবনে বিপদ নেমে আসে। আনন্দ মাসিকে দেখতে যায়। একটা অন্ধকার ঘরে মুখ ঢেকে মাসি শুয়ে আছে ভেবে আনন্দ মুখের ঢাকা খুলতেই দেখল একজন স্ত্রীলোক গলাকাটা অবস্থায় শুয়ে আছে। ঠিক সেই সময় পুলিশ এসে আনন্দকে খুনি ভেবে ধরে নিয়ে যায়। দুই দিন পর আনন্দের পুলিশ অফিসার বন্ধু মুকুন্দই আসল

খুনিকে ধরে আনন্দকে বাঁচান। এদিকে আনন্দ জানতে পারে, মাসি হুগলিতে আছে এবং সুস্থ। কিন্তু আনন্দ বুঝে উঠতে পারে না- তাকে কে ফোন করেছিল? মানুষ না ভূত?

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় খাবারের দোকানকে কেন্দ্র করে 'যবনিকা' গল্পটি রচনা করেছেন। কানা কাশীনাথ ও কালা শশীনাথ দু'বন্ধুর মিষ্টির দোকান হাতিবাগান বাজারে। বাইরে মিষ্টিভাব দেখালেও ভিতরে তারা পরস্পরকে হিংসা ও ঈর্ষা করে এবং একে অপরের ক্ষতির চিন্তা করে। শশীনাথ কাশীনাথের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত কম টাকায় গুঁড়ো দুধের পেটি কিনল, তারপর বেশি দামে বেচে লাভ করল। কাশীনাথও ভেজাল মিল্ক ক্রিমের টিন বেচতে চাইল শশীকে, কিন্তু শশী কিনল না। শশীনাথ, কাশীনাথের চালাকি বুঝতে পেরেছিল। এদিকে আবার রয়েছে পুলিশে জানাজানির ভয়। কাশী ভয় পেয়ে রিভলবার নিয়ে শশীকে খুন করতে যাচ্ছিল কিন্তু পথে কাশী নিজেই অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। তারপর কাশীনাথের প্রেতাত্মা শশীনাথের কাছে গিয়ে সব দোষ স্বীকার করল। লেখক প্রেতাত্মার মাধ্যমেই দুই বন্ধুর মনোমালিন্য, হিংসা-ঈর্ষার যবনিকাপাত ঘটিয়েছেন গল্পটিতে।

'আতঙ্ক' গল্পটিতে লেখক কোন ভূত বা আত্মার অবতারণা করেননি। কিন্তু এক অদ্ভুত মৃত্যুভয়ের আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের বক্তা লক্ষ্য করেন প্রকাশ ব্যাধি ও মৃত্যুকে ভয় করত না। কিন্তু অকস্মাৎ তার বাবা, দাদা ও ভাইপো মারা যায়। বাড়িতে পুরুষ মানুষ বলতে কেবল সে অবশিষ্ট থাকে। যে সংসার বাবা-দাদা অনায়াসে চালাত, তা প্রকাশের পক্ষে চরম কষ্টের হয়ে দাঁড়ায়। বাধ্য হয়ে প্রকাশ স্ত্রী নীলিমাকে নিয়ে একটা বস্তিতে উঠে আসে। কিন্তু কয়েক মাসের মাথায় নীলিমাও কলেরায় মারা যায়। প্রকাশ সম্পূর্ণ একা হয়ে যায়। থিয়েটার এবং সিগারেট খেয়ে নিতান্ত বেপরোয়া ভাবে-মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে দিন কাটাতে থাকে। ইতিমধ্যে বস্তিতে বসন্ত দেখা দেয়, দু'একজন বসন্ত রোগে আক্রান্তও হয়। এইসব দেখে প্রকাশও ভয় পেতে থাকে-মৃত্যুভয়। বক্তা লক্ষ্য করেন প্রকাশের চোখেমুখে মৃত্যুভয়ের আতঙ্ক।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি ভৌতিক গল্প 'প্রেতিনী'। গল্পের বক্তা শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌতিক তথা বর্ণময় জীবনের কাহিনি বলেছেন। কলকাতা শহরে সস্ত্রীক সুখে বসবাস করছিলেন শ্রীপতি কিন্তু ঘটনাক্রমে পরনারী বিধবা কিশোরীর সৌন্দর্যে পরকীয়ায় মত্ত হয়ে ওঠেন। নিজের স্ত্রী বাসন্তীকে অবহেলা করতে থাকেন। অবশেষে কিশোরীর পরামর্শে শ্রপতী বাসন্তীকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মারতে মনস্থ হন। বাসন্তী তা বুঝতে পেরে বাঁচার চেষ্টা না করে-গঙ্গার জলে তলিয়ে যান। স্বামীর আনন্দের জন্য একরকম আত্মহত্যা করেন বাসন্তী। এদিকে শ্রীপতি পথের কাঁটা দূর হয়েছে ভেবে কিশোরীর ঘরে গিয়ে দেখেন-তাঁর সমস্ত টাকা, গয়না নিয়ে কিশোরী পালিয়ে যায়। নিঃস্ব, সর্বশান্ত হয়ে গিয়েও শ্রীপতি পথে পথে কিশোরীকে খুঁজতে থাকেন। তেমনি একদিন রাত্রিবেলায় কলিকাতার নোংরা পথে কিশোরীকে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ শ্রীপতি কানের কাছে মৃত বাসন্তীর আওয়াজ শুনতে পান। সেই শুরু। বাসন্তী প্রেতিনী হয়ে শ্রীপতিকে তাড়িয়ে বেড়ায়। শ্রীপতি অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে নিজের স্ত্রীর প্রতি যে চরম লজ্জাকর, বেদনাদায়ক, নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, তার ফল সে হাতে হাতে পেয়েছে। নিজের পাপের ছায়া শ্রীপতিকে তাড়া করেছে প্রতিনিয়ত। গল্পটির কাহিনিবিন্যাসে লেখক অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

'জীবন নদীর তীরে' গল্পটি লেখকের এক অভিনব সৃষ্টি। মৃত হরলাল মিত্র মানুষের রূপ ধরে গল্পকথক ও তার পরিবারকে ভাড়াটে হিসেবে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়িটিতে ভূতের উপদ্রব শুরু হয়। কথকের ভাই অবিনাশ 'চক্র (প্ল্যানচেট)' করতে চাই, তার বোন সাবিত্রিকে মিডিয়ম করে। অবশেষে সাবিত্রির মাধ্যমে পুষ্প-তার জীবনের বেদনামধুর কাহিনি ব্যক্ত করেন। পুষ্পর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কাপড় বিক্রেতা হরিশ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুষ্পকে কলকাতায় নিয়ে আসে। কিন্তু বিয়ে না করে হরিশ পুষ্পর সাথে বসবাস করতে চাইলে, দুজনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এদিকে হরিশের বন্ধু পরেশবাবু পুষ্পর রূপ দেখে তাকে ভোগ করতে চাইলে, হরিশ পরেশবাবুকে মেরে তাড়িয়ে দেন। পুলিশের ভয়ে হরিশ পুষ্পকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাই, কিন্তু তখনি পরেশবাবু দলবদ্ধভাবে তাদের উপর আক্রমণ করেন। ঘটনাক্রমে হরলাল মিত্র পুষ্পকে অজ্ঞান অবস্থায় নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। হরিশের জেল হয়। এদিকে পুষ্পকে বিয়ে করে সুখে সংসার করতে থাকেন হরলাল মিত্র। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হরিশ পুষ্পকে নিজের সাথে নিয়ে যেতে চাইলে- হরলাল মিত্রের পিস্তলের গুলিতে দুজনেরই মৃত্যু হয়। হরলাল নিজেও আত্মহত্যা করেন। মৃত্যু পরেও তাদের

আত্মারা মুক্তি পায়নি, তাই হরলালের সামনে যখনই হরিশ উপস্থিত হয়, তাদের মধ্যে প্রচন্ড মারামারি শুরু হয়ে যায়। ভূত ও আত্মাদের ক্রিয়াকলাপ-তদ্‌জনিত কারণে জ্যান্ত মানুষদের আতঙ্ক, প্ল্যানচেটের প্রস্তুতি-সব মিলিয়ে এক অদ্ভূত রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন লেখক গল্পটিতে।

'সত্যি নয়' গল্পটি লেখকের একটি রূপকথার গল্প। গল্পটিতে ভূত নেই-তবে রয়েছে এক ভীষণাকৃতি দৈত্য। রাজা, রানি, রাজপুত্র, রাজকন্যার কাহিনি নিয়ে গল্পটি বেশ জমজমাট। গল্পটিতে দৈত্যের শেখানো আশ্চর্য বিদ্যার প্রয়োগ করে রাজকন্যা অনেক অসম্ভব কার্য খুব সহজেই করেছে। কোটালপুত্রের ভূমিকা কাহিনিটিকে অন্য এক মাত্রা দান করেছে। দৈত্যের দেশে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ও অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার সংমিশ্রণে গল্পটিকে বেশ আকর্ষণীয় রূপ দান করেছেন লেখক।

'ভূতুড়ে খাদ' গল্পটির প্লট লেখকের 'প্রেতপুরী' গল্পটির প্রায় কাছাকাছি-পাশাপাশি। শৈলজানন্দ দীর্ঘদিন কাজ করেছেন কয়লাকুঠিতে। কয়লাখনির দৈনন্দিন জীবন, ঘটনা-দুর্ঘটনা, শ্রমিকদের প্রতি ম্যানেজারদের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। কয়লাখনির খাদের নিচে অসংখ্য শ্রমিক পাথর বা কয়লা চাপা পড়ে, আবার কখনো খনিতে জল ঢুকে মারা যায়। যার দায় সম্পূর্ণ রূপে বর্তায় খনির মালিক ও ম্যানেজারের উপর। কারণ খনির মালিক ও ম্যানেজারেরা দরিদ্র শ্রমিকদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থায় করে না। তাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় যেনতেন প্রকারে অধিক মুনাফা অর্জন। অপঘাত মৃত্যুর ফলে শ্রমিকদের আত্মারা মুক্তি না পেয়ে অন্ধকার খাদেই বসবাস করতে থাকে। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে 'টুইল্যা মাঝি' চরিত্রটিকে-শ্রমিকদের প্রতিনিধি রূপে ব্যবহার করেছেন। 'প্রেতপুরী' গল্পটিতে দরিদ্র শ্রমিক টুইল্যা মাঝির আত্মা করুণ স্বরে ম্যানেজারের কাছে নিবেদন করেছেন কিন্তু 'ভূতুড়ে খাদ' গল্পটিতে সহজ-সরল টুইল্যা মাঝির প্রেতাত্মা ম্যানেজারকে মেরে প্রতিশোধ নিয়েছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'ঘরোয়া ভূত' গল্পে গ্রামবাংলার দু'টি ভূতের কথা বলেছেন। একটি পথের ভূত বা বাহিরের ভূত, আর একটি বাড়ির ভূত-যারা বাড়ির মধ্যেই বাস করে। লেখকের মতে এই বাড়ির ভূত গুলোই বেশি ভয়াবহ। লেখকের গভীর প্রত্যয় ছিল, আমরা যে জগৎটাকে দেখতে পাচ্ছি তা যেমন সত্য, আবার যা আমরা দেখতে পাচ্ছি না তাও তেমনি সত্য। শৈলজানন্দের গল্পের ভূত বা আত্মারাও আমাদের সাহাজ্য করে, বিপদ থেকে রক্ষা করে। ফেলে যাওয়া জীবনের প্রতি টান, সংসারের প্রতি মায়া থেকেই জন্ম নিয়েছে এই গল্পের ভূতেরা। এই গল্পটিকে দুটি ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথম গল্পে শ্যাম কবিরাজ রুগি দেখে রাত্রে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় প্রকান্ড বটগাছের তলায় কুড়ি-পঁচিশ দিন আগের মৃত রতন স্যাকরার ভূতের সঙ্গে দেখা হয়। অসুখের সময় রতন স্যাকরা এই শ্যাম কবিরাজেরই ওষুধ খেয়েছিল কিন্তু বাঁচেনি। মৃত রতন স্যাকরা কবিরাজকে কিছু বলতে চাইলে, প্রচন্ড ভয়ে কবিরাজ 'রাম রাম' করতে করতে গ্রামের দিকে ছুটেন। কবিরাজের পিছন পিছন সমান তালে ছুটতে থাকে রতন স্যাকরা। গ্রামে লণ্ঠনের আলো দেখা গেলে রতন থেমে যায় এবং কোনক্রমে রক্ষা পাই কবিরাজ, লেখকের ভাষায়,

> "পশ্চাতে শোনা গেল, রতন বলিতেছে, 'তোঁমার সঁঙ্গে এঁকটা কঁথা ছিঁল কোঁবরেজ, আঁচ্ছা, আঁজ যাঁও।"[৮]

দ্বিতীয় গল্পে পিসেমশাই-এর অসুখ শুনে বক্তা তাকে দেখতে যান চার মাইল দূরের এক গ্রামে। পথে পিসেমশাইকে দেখে বক্তা অবাক হয়ে যান। বক্তার প্রশ্নে পিসেমশাই বলেন তাঁর কিছুই হয়নি, আসলে পিসিমারই শরীর খারাপ। তাই তিনি ডাক্তার আনতে যাচ্ছেন। গ্রামে গিয়ে বক্তা শুনলেন আগের দিনই পিসেমশাই মারা গেছেন। পিসেমশাই-এর বড় মেয়ে সাবিত্রী জানায়, পিসিমাও খুব অসুস্থ-অজ্ঞান হয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছেন। রাত্রে বক্তা পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়লে-হঠাৎ একটা হাত দিয়ে ঝাঁকানি অনুভব করেন। সাবিত্রী ঘুম থেকে ওঠাতে চাইছে ভেবে বক্তা তার হাতখানি ধরলে, এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। লেখকের ভাষায়,

> "আধঘুমন্ত অবস্থায় হাতটা চাপিয়া ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। এইবার ঘুম ভাঙিয়া গেল। অন্ধকার ঘর। হাতে চুড়ি নাই, সুতরাং সাবিত্রী নয় সেকথা সত্য। শক্ত পুরুষের হাত বলিয়া মনে হইল। ডান হাতে হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বাঁহাত দিয়া একটু একটু করিয়া অনুভব করিতে করিতে তাহার কনুই পর্যন্ত আগাইয়া গেলাম। তাহার পর হাত দিতে গিয়া দেখি-ফাঁকা। কনুই পর্যন্ত মাত্র একখানা হাত। লেপের

> মধ্যেও ভয়ে একেবারে রোমাঞ্চিত হইয়া শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেলাম। মাথা হইতে পা পর্যন্ত ঝিমঝিম করিতে লাগিল।"[৯]

বক্তা তৎক্ষণাৎ উঠে পাশের ঘরে গিয়ে দেখেন সাবিত্রী ঘুমিয়ে রয়েছে এবং জ্ঞান ফিরে পিসিমা জল খেতে চাচ্ছেন। এই সময় বক্তাকে ঝাঁকানি দিয়ে কে জাগিয়ে দিল-তা ভালোই বুঝতে পারলেন।

'কে তুমি?' গল্পটি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট ভৌতিক গল্প। গল্পকথক বন্ধু সুজিতের সঙ্গে গ্রাম দেখতে এসে রাত্রিবেলায় একটি মেয়ে ভূতের পাল্লায় পড়েন। এ বিষয়ে সুজিত কথককে জানায়- সুন্দরী, অল্পবয়সি বিধবা সুবী মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আমগাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার লাশ পুলিশের ঝামেলার কারণে গ্রামের কেউ পোড়াতে চাইল না। অবশেষে গ্রামের লোক নানান তর্ক-বিতর্ক শুরু করলে লোকনাথ শাস্ত্রীয় বিধান তুলে ধরেন-

> "একে গলায় দড়ি, তায় বাসি মড়া, অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত না করলে শুধু মুখাগ্নি চলবে না, আর মুখাগ্নি না করে অগ্নিক্রিয়া করতে দোষ আছে। তাছাড়া যারা ওকে নিয়ে যাবে তাদেরও সে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শাস্ত্রে বলেছে- গলরুজ্জুঃ বৃক্ষশাখায়াং ত্রিসন্ধ্যাং কালেং যদি মৃত্তিকায়াং প্রোথিতঞ্চ অগ্নিক্রিয়া নৈবচ নৈবচ। তবে আমার বিবেচনায় গ্রামের দুজন বাউরি-বাগদি নিয়ে ওকে পুঁতে ফেলাই উচিত।"[১০]

সুবীর লাশকে পুঁতে ফেলার দিন কয়েকের মধ্যেই শেয়াল-কুকুরে টেনে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। এমন কি তার শরীরের হাড় গুলো সারা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতে থাকে। সুবী-র মাও রেললাইনে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করে। সেই থেকে সুবী-র আত্মা আমগাছটার চারপাশে, পোড়ো বাড়িটার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় এবং তার মা-কে খোঁজে। গল্পটিতে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গ্রামজীবনের সংস্কার-বিশ্বাস, বিধি-নিষেধ তুলে ধরেছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বৈচিত্র্যময় জীবনের নানা অভিজ্ঞতার প্রতিফলন তাঁর এক-একটি ভূতের গল্প। তাঁর সৃষ্ট ভূতেরা তথাকথিত ভয়ঙ্কর-বীভৎস চেহারার বদলে নিপাট ভালমানুষের চেহারায় হাজির হয়। শুধু হাবেভাবে মালুম হয় যে তারা ভূত। শৈলজানন্দের ভূতের গল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য- লেখক নিজেই গল্পের চরিত্র হয়ে গল্প বলে যান। তাছাড়া তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, সহজ-সুন্দর গল্প বলার ধরণ- তাঁর গল্পের মূল আকর্ষণী শক্তি। তাঁর গল্প বলার কৌশলই সাদামাটা গল্পকে অসামান্য করে তোলে। জীবনের পাওয়া না-পাওয়ার বেদনামধুর কালচক্রে শুধু মানুষ নয়, অশরীরী বিদেহী আত্মারাও যেন তৃষিত চাতকের মতো ঘুরে বেড়ায়। 'জীবন নদীর তীরে' গল্পটিতে পুষ্প, হরলাল, হরিশ মৃত্যুর পরেও জীবনের চাওয়া-পাওয়াকে ত্যাগ করতে পারেনি। তাই মৃত হরলাল জীবন্ত মানুষদের ডেকে এনেছে নিজেদের বাসস্থানে। তাঁর 'ন্যাড়া নন্দী' গল্পটিতে বিদেহী আত্মার প্রতি মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখা মুছে গিয়ে এমন একটা নতুন রসের সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে সবকিছু ছাপিয়ে থাকে মজা। বয়স্ক মানুষের ভয়জনিত জীবন-ট্রাজেডির গল্প লেখকের 'ভয়' গল্পটি। যে রঞ্জন ভূতজনিত সাহসিকতার গল্প সকলের কাছে মজলিশি ভঙ্গীতে ব্যক্ত করত, সে-ই মারা যায় ভয়ের কারণে। লেখকের 'ভয়ঙ্কর' গল্পটিতে দেখতে পাই, ভীতু দীননাথের জীবনে বিরাট পরিবর্তন। যে দীননাথ রাতের অন্ধকারে ঘরের বাইরে যেতে সাহস পেত না, সুন্দর সিং-এর মৃত্যুর পর সে অবলীলাক্রমে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকে। 'যবনিকা' গল্পটিতে লেখক দেখিয়েছেন খাবারের দোকানকে কেন্দ্র করে দুই বন্ধুর পারস্পরিক হিংসা-ঈর্ষার কাহিনি। যার সমাপ্তি ঘটেছে প্রেতাত্মার মাধ্যমে। 'প্রেতিনী' গল্পটিতে শ্রীপতি স্ত্রী হত্যাজনিত অপরাধ ও তদ্জনিত পাপের ফল সে হাতেনাতে পেয়েছে। কিশোরীও পালিয়েছে এবং তার জীবনও নরকে পরিণত হয়েছে। শৈলজানন্দের একাধিক গল্পে দেখতে পাই, ভূতেরা উপস্থিত হয়েছে মানুষের সাহায্যার্থে। 'ভূতুড়ে বই' গল্পটিতে বই সংলগ্ন ভূত অজিতের প্রাণ বাঁচিয়েছে। লেখকের এক আশ্চর্য সৃষ্টি 'অসম্ভব' গল্পটি। ভূত-নামানোর গুপ্ত-সমিতি, ভূতুড়ে যন্ত্রের আবিস্কার (যার সাহায্যে মৃত মানুষের সাথে তার আত্মিয়রা কথা বলতে পারবে) এবং এক নাছোড়বান্দা ভূতের সংমিশ্রণে লেখক গল্পটিকে সৃষ্টি করেছেন। লেখক কয়লাকুঠিতে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। কয়লাকুঠির মালিক, ম্যানেজারেরা দরিদ্র শ্রমিকদের প্রতি কীরূপ ব্যবহার করেন- তা শৈলজানন্দের নখদর্পণে ছিল। সেই অভিজ্ঞতার নিরিখেই 'ভূতুড়ে খাদ' ও 'প্রেতপুরী' গল্প দু'টি রচনা করেছেন। লেখক গল্পগুলিতে 'টুইল্যা মাঝি' চরিত্রটিকে দরিদ্র শ্রমিকদের প্রতিনিধি রূপে সৃষ্টি করেছেন। কয়লাকুঠির ম্যানেজারের প্রতি টুইল্যা মাঝির প্রেত একাধারে কাতর আর্তি জানিয়েছে, আবার শাস্তিও দিয়েছে। লেখক কয়লাকুঠিজনিত ভূতের গল্পে টুইল্যা মাঝিকে প্রতিবাদী চরিত্র

রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে একটি চরিত্রকে একাধিক ভৌতিক গল্পে ব্যবহার করেছেন অনেক সাহিত্যিক। যথা, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যের-ভূতান্বেষী 'বরদা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের- ভূত-শিকারি 'মেজকর্তা', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের- 'মোনা ওঝা' প্রমুখ। শৈলজানন্দ অদ্ভুত দক্ষতায় ভৌতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সাংসারিক জীবনের ভালোবাসা, মায়ামমতা ও স্নেহ-প্রীতির ছবি এঁকেছেন 'ঘরোয়া ভূত' গল্পে। 'কে তুমি?' গল্পে লেখক গ্রামবাংলার নিখুঁত চিত্রের পাশাপাশি দেখিয়েছেন কীভাবে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা এবং সামাজিক অনুশাসনের বন্ধন নারীজীবনকে তিলে-তিলে শেষ করে দেয়। একদিকে বাঁচার ইচ্ছা অন্যদিকে মৃত্যুভয়- এই দুইয়ে মিলে 'আতঙ্ক' গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন লেখক। শৈলজানন্দের একটি বিশেষ চরিত্র 'ঝুঁকোবাবু'। ঝুঁকোবাবুকে তিনি 'ভূতের গল্প' গল্পে বিখ্যাত করেছেন। মানুষের সাংসারিক দুর্দশার অবস্থায় অনেক সময় ভূতেরাও কষ্ট পাই। এই রূপ একটি ভূতকে সৃষ্টি করেছেন লেখক 'নমস্কার' গল্পে- যিনি মানবিকতা ও সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষের মতোই আচরণ করেছে। শৈলজানন্দের ভূতের গল্পগুলি মূলত চরিত্রপ্রধান। একের পর এক ঘটনার আবর্তে চরিত্রগুলি আলোকিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া লেখকের ভূতের গল্পগুলিকে বহুগুণান্বিত করেছে তাঁর সহজ-সরল ভাষা।

কল্লোল-যুগের কবি-সাহিত্যিকদের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মানুষের বিশেষত আসানসোল, রানিগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাখনির কুলি-কামিন, সাঁওতাল, বাউরিদের নিয়তিতাড়িত মর্মান্তিক জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। যাঁদের কথা বাংলা সাহিত্যের পাতায় আর কোনও সাহিত্যিক ঠাঁই দেননি এতকাল- সেই নামহীন, অন্ত্যজ মানুষগুলিকে নিয়ে তিনি কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেছেন। সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'-তে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে যথার্থই লিখেছেন,

> "তুচ্ছ আর গম্ভীর গল্প বলিয়া এমন আসর জমাইতে আর কাহাকেও দেখি নাই। ভূতের গল্প, সাপুড়ের গল্প, খুনের গল্প– তাঁহার অফুরন্ত স্টক ছিল। তিনি জীবনকে নাড়িয়া চাড়িয়া নানাভাবে দেখিয়াছিলেন।"[১১]

তথ্যসূত্র :

১. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৫ (১৯৫৮), পৃ. ৩৪৮
২. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, ভূত সমগ্র, ভয়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০২১, ফাল্গুন ১৪২৭, পৃ. ১৮, ২০
৩. তদেব, প্রেতপুরী, পৃ. ৪৩
৪. তদেব, ভূতুড়ে বই, পৃ. ৭১
৫. তদেব, কি?, পৃ. ৭৭
৬. তদেব, নমস্কার, পৃ. ৯৩
৭. তদেব, অসম্ভব, পৃ. ৯৭, ৯৮
৮. তদেব, ঘরোয়া ভূত, পৃ. ২৪২
৯. তদেব, ঘরোয়া ভূত, পৃ. ২৪৬
১০. তদেব, কে তুমি?, পৃ. ২৫৯
১১. তদেব, সম্পাদকের কথা, পৃ. ৭

গ্রন্থপঞ্জি :

১. ভূত সমগ্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০২১, ফাল্গুন ১৪২৭
২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৫ (১৯৫৮), প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি-১৯৯৯, পঞ্চম মুদ্রণ- ২০০৯

৩. সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, ৫৫ ডি, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- শ্রাবণ ১৪০২ (আগস্ট ১৯৯৫), চতুর্থ মুদ্রণ- আশ্বিন ১৪১৪ (সেপ্টেম্বর ২০০৭)

৪. ভৌতিক গল্পসমগ্র, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি, ২০০৪, পঞ্চম মুদ্রণ- অক্টোবর ২০১৭

৫. সব ভুতুড়ে, লীলা মজুমদার, সিগনেট প্রেস, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ- জুন ১৯৮৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ- জুলাই ২০১৬

৬. শরদিন্দু অম্‌নিবাস (পঞ্চম খন্ড), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ- ভাদ্র ১৩৮২, ষড়বিংশ মুদ্রণ- মাঘ ১৪২৫

৭. কিশোর ভৌতিক সমগ্র ১, হেমেন্দ্রকুমার রায়, পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৫, ১৫তম মুদ্রণ- জুলাই ২০২১

৮. ভূত-শিকারি মেজকর্তা এবং..., প্রেমেন্দ্র মিত্র, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৯, মাঘ ১৪১৫, পুনর্মুদ্রণ- সেপ্টেম্বর ২০১৮, আশ্বিন ১৪২৫

৯. গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শুভম্‌, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রকাশকাল- কলকাতা পুস্তকমেলা- ২০০৭

১০. ভয় সমগ্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বুক ফার্ম, ৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা- ৭০০০৩০, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর, ২০১৯

১১. অলৌকিক সমগ্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- পৌষ ১৪২৬, তৃতীয় মুদ্রণ- মাঘ ১৪২৮

১২. পঞ্চাশটি ভূতের গল্প, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০১, অষ্টম মুদ্রণ- ডিসেম্বর ২০১৭